Power from India.

(ক) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য (Features of Quit India Movement)

ভারত ছাড়ো আন্দোলন নানা দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ :

প্রথমত, '*হরিজন*' পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধিজির মন্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যে সংকট উপস্থিত হয়েছে তাকে আরও ঘনীভূত করার ইচ্ছা ভারতবাসীর যে নেই সে মনোভাব প্রস্তাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত করা হয়েছে। এই যুদ্ধে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়। যুদ্ধে জাপানের প্রবেশ ও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধতার ফল ভারতের পক্ষে মারাত্মক হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বর্মাজয়ের ফলে বর্মা থেকে ব্যাপক হারে উদ্‌বাস্তু ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্মার ব্রিটিশ নাগরিকদের জায়গা দেবার জন্য ভারতকে মূল্য চোকাতে হয়েছে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ অজানা ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল থেকেছে। বাংলার মানুষের অবস্থা ভয়াবহ। জল পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, গ্রামগুলি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাপানের আক্রমণ বুঝতে বা বাধা দিতে ব্রিটিশ সরকার এদেশের গ্রাম, শহর ও মানুষের উপর চাপ বাড়িয়েছে। বাংলায় উদ্‌বাস্তু সমস্যার বোঝা চেপে বসেছে, জাপানি সামরিক শক্তি তাদের দুঃখ ও যন্ত্রণা আরও বাড়িয়েছে। ভয় ও নৈরাশ্যের এই অবস্থায় গান্ধিজির '*হরিজন*' বার্তা মানুষের মনে সাহস এনেছে। ক্রীপসের প্রস্তাব ও দৌত্য ব্যর্থ হল। সংস্কার প্রশ্নে মীমাংসা হল না। গান্ধিজি জানালেন ব্রিটিশ এদেশ ত্যাগ না করলে জাপানের আক্রমণের সম্ভাবনা কমবে না।

দ্বিতীয়ত, ১৪ জুলাই ওয়ার্ধায় গৃহীত ভারত ছাড়ো প্রস্তাব নেহরু পেশ করেন। বোম্বাইয়ে অনুমোদিত (৭-৮ আগস্ট) এই প্রস্তাবে তিনটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হল—(ক) জাপানের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া

সম্ভব নয়; (খ) গণ আন্দোলনের উপর আঘাত ও নিপীড়ন নেমে আসতে পারে; (গ) কংগ্রেসের কাছে এই আন্দোলন শুধু স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, বিশ্ব স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের অঙ্গ।

তৃতীয়ত, বলা হল এই আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ নয়। স্বাধীন দেশ হিসাবেই ভারত ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে চায়। কংগ্রেসের এই দাবি ন্যায়সংগত। এ দাবি উপেক্ষিত হলে কংগ্রেস যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। কংগ্রেসের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার : 'It is going to be a fight to the finish.'

চতুর্থত, ভারত ছাড়ো প্রস্তাবের মধ্যেই ছিল আন্দোলনের সংকল্প, শক্তি ও পথ—

- ভারতের পক্ষে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ অত্যন্ত জরুরি।
- প্রাদেশিক সরকারগুলি গঠিত হবে ও এদের প্রথম কাজ হবে ভারতকে রক্ষা করা।
- প্রাদেশিক সরকারগুলি গণপরিষদের একটি প্রস্তাব দেবে।
- গণ-আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনা গৃহীত হল। এর পথ হবে অহিংস।
- ব্রিটিশ সরকারের শারীরিক প্রত্যাহার না ঘটলেও ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ অনিবার্য।
- গান্ধিজির হাতেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া হল : আবেদন করা হল ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধিজির নির্দেশ মেনে সুশৃঙ্খল সৈন্যের মতো লড়াই চালাতে হবে। গান্ধিজি জানালেন এই আন্দোলন হবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য শেষ আন্দোলন। আন্দোলনের স্লোগান হল : 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (Do or Die)।
- গান্ধিজি প্রতিরোধ আন্দোলনের যে পন্থা নির্দেশ করলেন তাতে বলা হল সরকারি চাকুরেরা তাদের চাকুরি ছাড়বে না, কংগ্রেসের কাছে তাদের আনুগত্য জানাবে। সৈন্য ও পুলিশের কাছে তার আবেদন নিজ দেশবাসীর উপর গুলিবর্ষণ যেন না হয়। ছাত্রদের কাছে তার পরামর্শ যতদিন স্বাধীনতা অর্জিত না হবে ততদিন তারা তাদের লেখাপড়া স্থগিত রাখবে। কৃষকদের কাছে তাঁর আহ্বান ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জানাবে যে জমিদার তাদের খাজনা বা রাজস্ব দেওয়া চলবে না। দেশীয় রাজাদের কাছে জানানো হল তারা ভারতীয় জনগণের সার্বভৌমিকতা মেনে নিন এবং তাঁদের প্রজাদের ভারতীয় জনগণের অংশ হিসাবে গণ্য করুন।

  গান্ধিজির নির্দেশ রইল, কিন্তু এই নির্দেশ জানানোর সুযোগ ছিল না, কারণ গান্ধিসহ প্রায় সব শীর্ষ নেতাই তখন বন্দি। প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন শুরুর আগেই তাঁদের বন্দি করা হয়েছে, সন্দেহ নেই একটি পর্যায়ে আন্দোলন চলেছে নেতৃত্বহীনভাবে।

পঞ্চমত, গণ-আন্দোলনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি কৌতূহলপ্রদ : ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকেই এই আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক বলে প্রচার করেছে এবং নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। গান্ধিজি নিজে এই প্রচারকে সরকারের 'Gross misstatements and misrepresentations' বলে উপহাস করেছেন। আন্দোলনের রূপ ও রীতি যে গান্ধিজির অহিংস সত্যাগ্রহের ভাবনাকে সামনে রেখে নির্ধারিত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রেগিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলকে একটি পত্রে তিনি জানাচ্ছেন "I cannot cancel the Congress rebellion which is of purely non-violent character. I am proud of it. I have no reparation to make for. I have no consciousness of guilt".[৩] আন্দোলনের দ্রুত অগ্রসর, বিকাশ ও বিস্তার থেকে কতকগুলি বিষয় উঠে আসে :

১. গান্ধিজি ও কংগ্রেস যে গণ-আন্দোলনকে রূপ দিয়েছেন তা এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক চরিত্র পেয়েছিল। পূর্বেকার আন্দোলনগুলি এক-একটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়েছিল দ্রুততার সঙ্গে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা সরকারকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এই আন্দোলন দৃঢ়ভাবে অহিংস আন্দোলন এবং বোঝানো ও মীমাংসাযোগ্য আলাপ-আলোচনাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

৩. সরকারের নিষ্ঠুর আক্রমণ ও নির্যাতনের পরিকল্পনা, নেতাদের বন্দি করা, জনগণকে আতঙ্কিত করার প্রয়াস আন্দোলনকে নতুন রূপ দিয়েছে।

৩. সত্যাগ্রহের পাশাপাশি অন্তর্ঘাত (Sabotage) চলেছে এই আন্দোলনে।

৪. এই আন্দোলনে জনগণের ভূমিকা ছিল নির্ভীক, বীরত্বপূর্ণ, প্রতিরোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পরবর্তীকালে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে তুলনামূলকভাবে তরুণ, বলিষ্ঠ, পরবর্তী প্রজন্মের সংগঠকেরা।

৫. আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সত্যিকারের মুখোশ খুলে গেছে। নিষ্ঠুরতা, শত্রুতার সঙ্গে সমানে চলেছে সরকারের দুর্নীতি, অযোগ্যতা।

৬. এই আন্দোলন দেশে ও বিদেশে ভারতের বন্ধু ও শত্রু কারা তাদের স্বরূপ নির্দেশ করেছে। ভারতীয় নেতাদের অবস্থানও এই আন্দোলনের ফলে নতুনভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

গান্ধিজি জানালেন "I have no shadow of doubt that passage through fire and suffering by thousands of Congressmen and Congress sympathisers has raised status of India and strength of the people"[৪] গান্ধিজি মনে করেন, ৪২-এর আন্দোলন জনগণের প্রতিক্রিয়া, কংগ্রেসে-বিরোধিতা বা পক্ষপাত বুঝতে সাহায্য করেছে। নেহরু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ সম্পর্কে তার গর্বের কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন "It was a mighty and staggering phenomenon to see a helpless people spontaneously rise in despair without any leader, organization, preparation or arms. They bravely suffered, endured and sacrificed many things." সর্দার প্যাটেল তাঁর বন্দিমুক্তির পর জানালেন "Hold fast to the faith that every letter and the spirit of the August Resolution is Brahma's own inscriptions. Not a word could be altered from its text."[৫]

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নতুনত্ব এর সময় নির্ধারণে, এর সঙ্গে যুক্ত কঠোর দাবিপত্রে, আন্দোলনের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া, ফলাফলে, সর্বোপরি জনগণের ব্যাপক অংশের এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ার প্রতিরোধ শক্তিকে জাগ্রত রাখার নিরিখে।

(খ) আন্দোলনের বিস্তার : তাৎপর্য ও ফলাফল (Expansion of the Movement : Significance and Result)

ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রায় দু-বছর কাল স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৪২-১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ—এই সময়কালের মধ্যে এই আন্দোলন কয়েকটি পর্যায়ে বিস্তারলাভ করেছিল।

প্রথম পর্যায়ে গান্ধিজি সমবেত প্রতিনিধিদের কাছে প্রস্তাবটি পাস হবার পর একটি বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই মুহূর্তে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হচ্ছে না। নেতৃত্বের ক্ষমতা পেয়ে তিনি চাইলেন ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কংগ্রেসের দাবি জানাবেন এবং তা গ্রহণ করার আবেদন জানাবেন। সুতরাং দু-তিন সপ্তাহের আগে আন্দোলনে সরাসরি যাওয়া যাবে না। সুতরাং এই সময় কিছু গঠনমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা যেতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হল চরকা কাটা। প্রত্যেকেই নিজেদের স্বাধীন মানুষ মনে করে অগ্রসর হবেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদতলে তারা আর পড়ে নেই। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য গান্ধিজি ও ভাইসরয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের জন্য আর অপেক্ষা করেনি। সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের দ্রুততা লক্ষণীয়। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা শেষ হবার পরই ৮ আগস্ট মধ্যরাত্রে গান্ধিজি ও কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হল। বোম্বাই থেকে বিশেষ ট্রেনে করে তাঁদের দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। গান্ধিজিকে আগা খান প্রাসাদে (পুনা) এবং অন্যান্য নেতাদের আহমদনগর দুর্গে বন্দি করে রাখা হল। ৯ আগস্ট সকালেই ভারত ছাড়ো প্রস্তাব ও গান্ধিজিসহ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর পৌঁছে গেল। এমন অপ্রত্যাশিত সরকারি ব্যবস্থা জনসাধারণের গোচরে ছিল না। স্বাভাবিকভাবে প্রতিক্রিয়া হল দ্রুত ও স্বতঃস্ফূর্ত। শহরকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হল। জনজীবন স্তব্ধ হল, সমস্ত কাজকর্ম স্থগিত রইল। প্রত্যেক শহরেই হরতাল

পালিত হল। নেতাদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় সংগীত, প্রচার, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ শুরু হল। যদিও এই পর্বে হিংসা ছড়িয়ে পড়েনি। পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণই ছিল, কিন্তু উত্তেজনার অভাব ছিল না। তবে জনসমাবেশ ও বিক্ষুব্ধ জনতার সংখ্যা সরকারের কাছে উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি সতর্কতা অগ্রাহ্য করে জনতা সভা ও সমাবেশ থেকে সরে যেতে অস্বীকার করে। এর পরিণতি হল মারাত্মক। নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বহু জায়গায় (আনুমানিক ৪১টি স্থানে) এবং গুলিতে নিহত হয়েছে ৭৬ জন এবং বহু মানুষ আহত হয়েছে গুরুতরভাবে। '*Freedom Struggle*'-এর লেখকত্রয়ের ভাষায় "It was the same everywhere—public demonstration, violence, police, firing, arrest"[৬] ছাত্র, যুবক, শ্রমিক সকলেই আগস্ট আন্দোলনের সঙ্গে শহরের মূল কেন্দ্র বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর, বরোদা, দিল্লি প্রভৃতি অঞ্চলে যুক্ত হয়ে পড়েন। ধর্মঘট চলল, যুদ্ধের সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হল, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেল আন্দোলনের নতুন গতি, এই পর্বে আন্দোলন আর অহিংস রইল না। শহর থেকে গ্রামে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। লুঠতরাজ, হত্যা, রেলওয়ে ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করা, সড়ক ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ছিন্ন করা এই পর্বের আন্দোলনে নতুনত্ব এনেছে। থানা আক্রমণ করা হয়েছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ হয়েছে। বন্দিমুক্তির দাবিতে আন্দোলনকারীরা সরব হয়েছে। এই পর্যায়ে আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্রের সাতারা, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায়। মেদিনীপুরের তমলুক শহরে এই পর্বে ঘটে গেল কোর্ট, থানা অবরোধ, পুলিশের ব্যাপক নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড এবং বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মবলিদান। স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার গঠনের পেছনে ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। বলা যেতে পারে নির্যাতনের মাত্রা যেভাবে ছড়িয়েছে তাতে দেশে দেখা গেল পুলিশরাজ। নিরস্ত্র জনতাকে পুলিশের নির্যাতন ও গুলিতে ব্যাপকহারে প্রাণ দিতে হয়েছে। পুলিশের গুলিতে দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ১৯৪২-এর বিপ্লব যেন স্মরণ করায় ১৮৫৭-র দিনগুলিকে। গণ-আন্দোলন ও প্রতিরোধের এমন অভূতপূর্ব সংগঠন আগে দেখা যায়নি। বাংলাদেশে কাঁথি ও তমলুক মহকুমা ছাড়াও ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, দিনাজপুর, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি সর্বত্রই এই আন্দোলনের রেশ পড়েছে। শ্রমিক শ্রেণি, সাঁওতাল, আদিবাসী ও উপজাতিরা এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন দুর্বার গতিতে চলেছে প্রধানত ৪২-এর আগস্ট-এর পরবর্তী ৬ মাস। সুনীল সেন মনে করেন, কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনগুলির মধ্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্যাপকতম ও জঙ্গি। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই এই আন্দোলন প্রসারিত হয়েছিল। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলায় এই আন্দোলন বিপ্লবী অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। শহরের মধ্যবিত্ত ও গ্রামের কৃষকদের যোগদান এই আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত অঞ্চলে ইতিপূর্বে কংগ্রেস শক্তিশালী গণভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিল, প্রধানত সেইসব অঞ্চলে ভারত ছাড়ো আন্দোলন অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী হয়েছিল। কয়েকটি অঞ্চলে দেখা গেল কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষকসভার আন্দোলন সাধারণ কৃষকদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করেছিল, সেই চেতনা প্রতিভাত হল ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। বিহার এবং মেদিনীপুরে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৭]

ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে সরকারি বিবরণ বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন টটেনহ্যাম। এই বিবরণ থেকে যা জানা যায় তা হল : (১) আন্দোলন কেন্দ্রীভূত ছিল বিহার ও পূর্ব যুক্তপ্রদেশে। (২) প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল ছাত্রদের হাতে। (৩) শহরের আন্দোলন দ্রুত দমন করা সম্ভব হয়েছিল। (৪) আমেদাবাদ, দিল্লি, কানপুর এবং জামশেদপুরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে। (৫) মুসলমানরা আন্দোলনে যোগদান করেননি। (৬) উত্তর-প্রদেশ ও বোম্বাইতে আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের চেহারা নেয়। (৭) সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। (৮) খাজনা বন্ধের কথা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি প্রচারপত্রে জানালেও, গ্রামাঞ্চলে খাজনা বন্ধ আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। (৯) আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখে কংগ্রেস ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন আর একটি আন্দোলন সংগঠনের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। টটেনহ্যামের বিবরণ অনুসারে সরকারি দমননীতি জয়ী হয়েছিল।[৮]

সুনীল সেন আন্দোলনের আঞ্চলিক চরিত্র সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সার কথা হল : (১) অনেক অঞ্চলে আন্দোলনের পেছনে গণসমর্থন ছিল। (২) আন্দোলন শুধু শহরে সীমাবদ্ধ ছিল না। (৩) ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল 'স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব' (হাচিসন)। বিহারে গণবিদ্রোহ ঘটেছে। যুক্তপ্রদেশে এই আন্দোলনের সঙ্গে ছিল বিপুল জনতা। ছাত্রসমাজ ছিল চঞ্চল। বালিয়াড়ে সরকারি শাসন অবলুপ্ত হয়েছে। আজমগড়ে জনতা-পুলিশের সংঘর্ষ দু-ঘণ্টা ধরে চলেছে। যুক্তপ্রদেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছিল অভূতপূর্ব। আন্দোলনের পেছনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। কংগ্রেসকে যখন মনে হয়েছে মুমূর্ষু, অথচ এমন এক সংগঠনই দেশের শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। (৪) হাইকোর্ট এই আন্দোলনকে প্রধানত কৃষক বিদ্রোহ বলেছে। বিহারে বিশের দশক থেকে যে জাতীয় আন্দোলন চলেছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন তারই পরিণতি। কৃষকসভা (কমিউনিস্ট পরিচালিত) আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, যদিও কৃষকসভার সভাপতি আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন। (৫) আন্দোলনে নতুন নেতৃত্বের বিকাশ দেখা গেল। জনতার বৃহত্তর অংশ ছিল গ্রামের মানুষ। উচ্চবর্ণের মানুষ, কুর্মী, তেলি, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যোগদানকারীরা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ব্রাহ্মণ, ভূমিহারদের হাতেই ছিল নেতৃত্ব। যদিও ছাত্র, শিক্ষক, কুলি-মজুরদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। (৬) সরকারি কেন্দ্রগুলি ছিল আক্রমণের লক্ষ্য। (৭) আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে দুর্বল বিদ্রোহীদের গেরিলা যুদ্ধ চলেছে। তবে আন্দোলন শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। আন্দোলনের ধারা এক ও অবিচ্ছিন্ন ছিল—এ প্রশ্নে ব্রিটিশ লেখক হেনিংহাম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে শ্রেণিগত আন্দোলনের রূপ নিয়ে মতবিরোধ ছিল।[৯]

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের খতিয়ান বেশ কিছু কৌতূহলজনক পরিণতির সাক্ষ্য দেয় :

* কংগ্রেস কমিটিগুলি অবৈধ ঘোষিত হয়েছে, কংগ্রেস কার্যালয় বাজেয়াপ্ত হয়েছে, স্বরাজভবন ও আঞ্চলিক সদর দপ্তরগুলির দখল নেওয়া হয়েছে, সমাজসেবামূলক খাদি ও হরিজন কেন্দ্রগুলিকেও রেহাই দেওয়া হয়নি।
* প্রতিরোধ আন্দোলনের শুরু হল অরুণা আসফ আলির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে।
* শোভাযাত্রা, বিক্ষোভের সঙ্গে, সমানতালে চলেছে পুলিশের লাঠিচার্জ, নিগ্রহ, গুলি।
* পুলিশ থানা, পোস্ট অফিস, সরকারি গৃহ, রেলস্টেশন, রেলপথের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে।
* জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্যরা গোপন কার্যকলাপ ও দুঃসাহসিক তৎপরতার সঙ্গে বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিচালনা করেছেন। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটিও গড়ে তোলা হয়েছে।
* সরকারি দমননীতির পরিসংখ্যানের সূত্রে জানা যায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬০,২২৯, ভারত নিরাপত্তা আইনে ধৃত ১৮,০০০, পুলিশ ও মিলিটারি দ্বারা নিহত প্রায় ৯৪০, আহতের সংখ্যা ১,৬৩০।
* তমলুকে বিদ্রোহী কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ ধরে।
* সামরিক বাহিনী নামানো হয়েছে ৬০টি জায়গায়, পুলিশের গুলি চলেছে ৫৩৮টি স্থানে।[১০]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এর রেশ থেকে গেছে। পুলিশি অত্যাচার ও দমন নীতি আন্দোলনের সাফল্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও বা আন্দোলনের গতি ও নেতৃত্বের মধ্যে সংহতির অভাব দেখা গেলেও বা আন্দোলন সম্পর্কে মতাদর্শগত বিরোধ থাকলেও, ভারত ছাড়ো আন্দোলন আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছে। চিয়াং কাই শেক, পার্ল বাক প্রমুখ আন্দোলনের পক্ষে মত দিয়েছেন। নেহরু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। তমলুক মহকুমা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছে। মহিলা ও বিপ্লবী সাঁওতাল বাহিনীর অংশ গ্রহণে এই আন্দোলন নতুন গতি পেয়েছে। গ্রামের মানুষেরা বিদ্রোহীদের পুলিশ ও সৈন্যদের পারস্পরিক অত্যাচারের মুখে রুখে দাঁড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভের নানা ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—সরকারের বঞ্চনা নীতির (Denial Policy) মুখে পড়েও বিদ্রোহীরা আন্দোলনে অবিচল থেকেছে। ধানের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, যুদ্ধের জন্য অর্থ দেওয়ার চাপ বেড়েছে, জরিমানা আদায়ের হার বেড়েছে, তবু মানুষ অবিচল থেকেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ ও পশুর

মৃত্যু, ত্রাণকার্য বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন থেমে থাকেনি। কিছুটা ভাটার টান হয়তো ছিল। পরবর্তী সময়ে মন্বন্তরের প্রকোপ, সরকারি উদাসীনতা ও পুলিশের অত্যাচার সত্ত্বেও আন্দোলন দমে যায়নি। সরকারি দমন নীতি ও ঔদাসীন্যের কারণে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। কমিউনিস্ট নেতারা জনযুদ্ধের নীতি আঁকড়ে থাকলেও নিষ্কৃতি পাননি।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পদ্ধতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও দ্রুতগতি আবার কখনও মন্থর গতিতে চলেছে এই আন্দোলন। দেখা গিয়েছে কখনও প্রকাশ্য প্রতিরোধ, আবার কখনও নীরব প্রচার আন্দোলন। একটি পর্বে দেখা গেল বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধ (মহারাষ্ট্রের সাতারা), আরেকটি পর্বে সন্ত্রাস ও গুপ্তহত্যা, ভুখা মিছিল, ত্রাণ বণ্টন, তীর ধনুক নিয়ে সাঁওতালদের সমাবেশ। ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে (দুর্ভিক্ষ অন্যতম কারণ), বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে (কমবেশি সব প্রদেশেই)। সরকারি কেন্দ্র ও থানা ছিল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। জনতা ও পুলিশ সংঘর্ষ লেগেই ছিল। রাজস্ব বন্ধ, খাজনা বন্ধ, সুতাকলে ধর্মঘট, স্বরাজ পঞ্চায়েত গঠন, জমির দলিল ধ্বংস, জেল অভিযান ছিলই। লিনলিথগো চার্চিলের কাছে তাঁর বার্তায় জানিয়েছেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর এত বড়ো বিদ্রোহ আর ঘটেনি।

তবে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেও, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নেতারা দেশপ্রেমিকের মর্যাদা পেয়েছেন। মানুষের আত্মত্যাগের মূল্যও কম ছিল না। আন্দোলন গণসমর্থন যে আদায় করে নিতে পেরেছে এবং ইংরেজ সরকারের কাছেও যে লঘু ছিল না সরকারি দমন নীতি তার প্রমাণ। সরকারের যুদ্ধনীতির প্রভাব পড়েছে আন্দোলনে। খাদ্য-সংকট, দুর্ভিক্ষে গ্রামাঞ্চলে যে ক্ষতি হয়েছে, মূল্যবৃদ্ধির ফলে যে দুর্দশা ঘটেছে তার ক্ষতিকর প্রভাব কাটানো সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দেও 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন থেকে গেছে।

মূল্যায়ন : ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ধারাকে তেজবাহাদুর সাপ্রু বলেছেন, 'ill considered and ill opportune'। আম্বেদকারের মতে এটি দায়িত্বজ্ঞানহীন ও পাগলামির নিদর্শন। কমিউনিস্ট মহলে গণযুদ্ধের (People's War) ডাক, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রত্যাহৃত হোক এটাই ছিল তাঁদের দাবি। হিন্দু মহাসভাও আন্দোলনের সঙ্গে সহমত ছিল না। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও জয়প্রকাশ নারায়ণ জানিয়েছেন আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল, সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল, স্পষ্ট কর্মসূচির অভাব ছিল। আন্দোলনের সঙ্গে গণবিদ্রোহের সদর্থক যুক্তি পেশ করা হলেও, সারা ভারত আন্দোলনে ফেটে পড়েছে, সব শ্রেণির মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একথা বলা যাবে না। ধনিক শ্রেণি আন্দোলনের পেছনে ছিল না। বুদ্ধিজীবী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি এর সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত ছিল না। শুধু ছাত্র, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মহিলা এবং নিম্নমধ্যশ্রেণি এর সঙ্গে ছিল এমন কথাও বলা হয়। কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনে অন্তর্ঘাত করেছে, রাজা গোপালাচারীর মতো নেতা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেননি, মুসলমানরা তো এই আন্দোলনের সঙ্গেই ছিল না। গান্ধিজি শেষ পর্বে এই আন্দোলনের পন্থার সঙ্গে একমত ছিলেন না, শ্যামাপ্রসাদ সরকারি সাহায্য ও বণ্টন নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আন্দোলন বিষয়ে বিরূপ হয়ে ত্রাণবণ্টনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন।

তবে একথা বলা সংগত নয়, গান্ধিজি ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে সরে গেছেন। গান্ধিজি হিংসা, গণহত্যার ব্যাপক প্রকাশে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে সরে গিয়ে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ২১ দিনের দীর্ঘ অনশনে বসেন। আন্দোলনের প্রাথমিক নেতৃত্ব তাঁর হাতেই ছিল। এক অর্থে তিনিই ছিলেন আন্দোলনের সূত্রধর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য পেতে আর সময়ের অপেক্ষামাত্র—ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি থেকে তা বোঝা যাচ্ছিল। কারণ এই আন্দোলনের পাশাপাশি খাদ্য আন্দোলন, মহামারি, সরকারের উপর চাপ, ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধজনিত ক্ষতি ইত্যাদি নানা কারণেই ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের ইচ্ছা জাগরিত হয়েছে। স্বাধীনতার সংকেত ধ্বনি শোনা গেল। গ্রাম বাংলার আর্তনাদ (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে মন্বন্তরের কারণে), অন্যান্য ফ্রন্টে স্বাধীনতার দাবি (আজাদ হিন্দ বাহিনী, নৌবিদ্রোহ, তেভাগা, তেলেঙ্গানার চাপ), গণপরিষদের দাবি—এ সব কিছু স্বাধীনতা যে দূরে নয় তা জানিয়ে গেল। স্বাধীনতা এল বটে তবে ভারত বিভাজনের মূল্যে।